বনাধিকার আইন ও পশ্চিমবঙ্গ

সৌমিত্র ঘোষ

প্রাককথনঃ অরণ্যের অধিকারের লড়াই বনাম সরকারী পাট্টা

সম্প্রতি, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এলাকার চিলাপাতা বনাঞ্চলে, কোদাল বস্তি বনগ্রামের বাসিন্দারা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে গ্রাম-সংলগ্ন বনের ওপর তাঁদের অধিকারের কথা ঘোষণা করেন। সাইনবোর্ডের লেখা এবং ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী, এই অধিকার “বনবাসী তফশিলী জনজাতি এবং অন্য পারম্পরিক বনবাসীদের বনাধিকার স্বীকার আইন, ২০০৬” (সংক্ষেপে, বনাধিকার আইন) অনুযায়ী তাঁদের প্রাপ্য। ঘটনাটি সংবাদমাধ্যম মারফত সাধারণে পৌঁছায় এইভাবে যে গ্রামবাসীরা ‘সংরক্ষিত সরকারি’ জঙ্গল দখল করেছেন, এমনকি কোথাও এমন কথাও লেখা হয় যে দখল করা জঙ্গল গ্রামের লোক নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবেন। এই অভিযোগ সমর্থিত হয় ওই এলাকার বনাধিকারিকদের বক্তব্যে, যারা ঘটনাটিকে বে-আইনী চক্রান্ত বলে আখ্যা দিয়ে হাসিমারা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, বনবিভাগ এবং পুলিশের লোকজন গ্রামবাসীদের টাঙানো চারটি সাইনবোর্ডের মধ্যে দুটি খুলে নিয়ে যান। পরে হাসিমারা থানা সুত্রে জানা যায় ওগুলি নাকি ‘বাজেয়াপ্ত’ হয়েছে। এর পরের দিন, কোদাল বস্তি গ্রামসভার পক্ষ থেকে বনবিভাগের বিরুদ্ধে পালটা এক অভিযোগ দায়ের করা হয়।

কোদাল বস্তির ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্তমূলক। এই রাজ্যের আর কোথাও বনবাসী মানুষ বনাধিকার আইন অনুযায়ী অরণ্যের অধিকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করার এরকম উদ্যোগ আগে নেননি, সম্ভবত গোটা দেশেও তুলনীয় কিছু ঘটেনি। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের বিভিন্ন বনখন্ডে অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই বনগ্রামের বাসিন্দারা বনাধিকার আইনে লিখিত অধিকারগুলি দাবী করে আসছেন। বিশেষত কুচবিহার বন-এলাকার চিলাপাতা অরণ্যে, ১২টি গ্রামের গ্রামবাসীরা আলাদা আলাদা গ্রামসভা বানিয়ে, লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে, অরণ্য সম্পদের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরকে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে চিঠি লিখে তাঁরা যৌথভাবে জানান, গ্রামসভার সম্মতি ছাড়া এলাকার বনাঞ্চল থেকে কাঠ বা অন্য বনজ সম্পদ আহরণ বা বিক্রী করা যাবে না। বনবিভাগের নিত্যকার বন-সাফাই বা ক্লিয়ার ফেলিং-এর কাজও এর পর বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে, ২০০৮-এর এপ্রিলে, কার্শিয়াং বন এলাকার তাইপুতে সরকারী কাঠের ডিপোটি প্রায় তিন মাস বন্ধ রাখেন এলাকার বনগ্রামবাসীরা। প্রায় দু মাস বন্ধ থাকে কোদাল বস্তির কাঠের ডিপোটিও।

পরপর এইসব ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগ যারপরনাই ক্ষুব্ধ, বিভিন্ন সভা ইত্যাদিতে এবং সংবাদমাধ্যমকে তাঁরা বারম্বার জানাচ্ছেন, বনাধিকার আইনের প্রকৃত রূপায়নকারী তাঁরাই, নানান জায়গায় তাঁরা আদিবাসীদের ‘পাট্টা’ দিচ্ছেন, এবং কিছু কু-চক্রী, সরল-গ্রামবাসীদের-বিভ্রান্ত-করনে ওয়ালা ‘শক্তি’ যদি মধ্যস্থান থেকে বাগড়া না দিত, কবে আরো অনেক ‘পাট্টা’ ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলা যেতো। বনবিভাগের আমলারা এবং সরকারের বনমন্ত্রী ও অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ মন্ত্রী নিয়ম করে এই ‘শক্তি’দের গাল পাড়ছেন। যেহেতু বিষয়টি নিতান্তই ‘আইনী’, এবং যে কোন আইন বিষয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামান কম, বনাধিকার আইন এবং তার প্রয়োগ নিয়ে প্রকৃতই নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এ কারণে অবশ্য সরকারী পাট্টা বিলির অনুষ্ঠান বন্ধ হয়নি। জেলায় জেলায় ঘুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পাট্টা বিলি করে যাচ্ছেন। ২০১০-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গে বনাধিকার আইন মোতাবেক পাট্টা দেওয়া হয়েছে তফশিলী জনজাতিভুক্ত ২২,০০০ পরিবারকে। এই সময় পর্যন্ত সরকারী হিসাব অনুযায়ী দাবীপত্র জমা পড়েছে মোট ১,৪২,৭৮৩। লক্ষ্যণীয়, ২০০৯-এর জুলাই-এ এই সংখ্যাটি ছিলো ১২০০০০, পাট্টাপ্রাপকের সংখ্যা ছিলো ৫০৪৯। এখনো পর্যন্ত কোনো অন্য পারস্পরিক বনবাসীকে পাট্টা দেওয়া হয়নি।

এই আইনের প্রতিপাদ্য কি? কিভাবেই বা এই আইনের প্রয়োগ করছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার? হইচই করে পাট্টা বিতরণের পিছনের গল্পটাই বা কি? নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য আইনটিকে কিভাবে ব্যবহার করবেন আদিবাসী-অরণ্যবাসী মানুষ?

বনাধিকার আইন, ২০০৬ : আইনে যা বলা আছে

প্রস্তাবনা

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে ভারতবর্ষের সংসদে ঐতিহাসিক বনাধিকার আইন পাশ হয়। “বনবাসী তফশিলী জনজাতি এবং অন্য পারস্পরিক বনবাসীদের বনাধিকার স্বীকার আইন, ২০০৬” নামের নতুন এই আইনটি নিয়মমাফিক বিজ্ঞাপিত হয় ২০০৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর। অর্থাৎ ওই দিন থেকেই আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। আইনের মূল ধারাগুলি খুঁটিয়ে দেখার আগে প্রস্তাবনা থেকে শুরু করা যাক।

আইনটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে রাষ্ট্র ও সরকার মেনে নিচ্ছেন যে অরণ্যবাসী মানুষদের বিভিন্ন অধিকার আছে, এবং এই অধিকারগুলিকে স্বীকার করা প্রয়োজন। আইন চায় এই অধিকারগুলিকে স্বীকার করতে, এবং যাতে অরণ্যবাসী মানুষেরা এগুলি অর্জন করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে।

প্রস্তাবনায় আছে, “সমস্ত অরণ্যবাসী মানুষের স্বীকৃত অধিকারগুলির মধ্যে আছে, বনসম্পদের ও জীববৈচিত্রের যথাযথ দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের ও সংরক্ষণের, এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা। এইভাবে, অরণ্যবাসী মানুষের জীবিকা ও খাদ্য-নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে, বন সংরক্ষণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিকেই আরো শক্তিশালী করে তোলা যাবে”।

স্পষ্টত, আইন বলছে যে বনবাসীদের স্বীকৃত অধিকারের মধ্যে বন ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণও থাকছে, এবং মানুষের অংশগ্রহণের ফলে সংরক্ষণের কাজ আরো ভালোভাবে চলবে। আইন বলছে মানুষের “দায়িত্ব” ও “কর্তৃত্বের ক্ষমতা”র কথা, যার অর্থই হলো বনবাসীরা এখন সংরক্ষণের কাজে, এবং নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

প্রস্তাবনায় স্বীকার করা হয়েছে, “যে সব বনবাসী মানুষের অস্তিত্ব বনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যাঁদের ছাড়া বন এবং বনভূমির দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ সম্ভব নয়, নিজেদের আদি বাসভূমি ও বাসস্থানের অরণ্যে তাঁদের অধিকারগুলি ঔপনিবেশিক সময় থেকেই ঠিকমতো স্বীকার করা

হয়নি।এমনকি স্বাধীন ভারতবর্ষেও এই অধিকারগুলি স্বীকৃতি পায়না,এবং এর ফলে বনবাসী মানুষদের প্রতি এক ঐতিহাসিক অন্যায সজ্ঞাটি হতে থাকে ”।

বিষয়টি পরিষ্কার। আইন বলছে যে ঔপনিবেশিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত, যাবতীয় সরকারগুলি অরণ্যবাসীদের ন্যায্যসঙ্গত অধিকারগুলিকে নথিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এর ফলে যে শুধু এই মানুষেরাই বিপন্ন হয়েছেন তাই নয়,বিপন্ন হয়ে পড়েছে অরণ্যও। বনবাসী মানুষ যদি না ভালো থাকেন, বনও ভালো থাকতে পারে না।

প্রস্তাবনায় আরো বলা আছে, “সরকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন এমন মানুষ সহ অরণ্যবাসী সমস্ত মানুষের বাসভূমির নিরাপত্তার অভাব, এবং বনসম্পদের উপর তাঁদের অধিকারের সমস্যাগুলি দূর করা একান্তই দরকার হয়ে পড়েছে ”।

এ অবধি নিশ্চয় কোনো বিভ্রান্তি নেই। অতঃপর আইনের কিছু মূল ধারায় আসা যাক।

বনাধিকার আইনঃবনজ সম্পদের উপর অধিকার

আইনের ২-এর(ক) ধারা অনুযায়ী, বনবাসী মানুষের ব্যবহৃত জংগল এখন গ্রামসভার সাধারণ সম্পত্তি বা কমিউনিটি ফরেস্ট রিসোর্স।এই জংগল এবং অন্য যে কোন জঙ্গলের জ্বালানী কাঠ,বাঁশ,ঘাস,ফলমূল, ভেষজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য লতাপাতা সহ সব ধরণের অকার্ঠল বনজ সম্পদের বা এনটিএফপি(নন-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস)-র মালিকানা(ধারা ৩-এর গ) গ্রামের মানুষের।এছাড়াও জাতীয় উদ্যান,অভয়ারণ্য সহ সব ধরনের জংগলেই এনটিএফপি সংগ্রহ, পশুচারণ ও মাছ ধরার অধিকার(৩-এর ‘ঘ’) পাচ্ছেন অরণ্যবাসী মানুষ।যদিও বনজ সম্পদ ব্যক্তিগত ভাবে সংগ্রহ করা যাবে, মাছ ধরা ও চারণের অধিকার সাধারণের,অর্থাৎ গ্রামসভার অনুমতিক্রমে চারণ করানো বা মাছ ধরা যেতে পারে। বনসম্পদের ‘মালিকানার’ বিষয়টি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার।যে কোনো গ্রামসভার আওতাভুক্ত বনাধিকারভোগীরা যদি যৌথ ও ব্যক্তিগতভাবে এই সম্পদের ‘মালিক’ হন,বনবিভাগ বা সরকারের সেখানে আদৌ কোনো হক থাকে না।

৩ এর (খ) উপধারায় বলা আছে, পুরোনো জমিদারী বা রাজকীয় জঙ্গলে নিস্তার বা অন্যান্য যে সব গোষ্ঠী-অধিকার ছিলো,তা আবার এই আইন মারফত দাবী করা যাবে। যথা,পুরুলিয়ার মাঠা অঞ্চলে(এবং অন্যত্র) গ্রামবাসীদের অরণ্যের কাঠে লিখিত অধিকার ছিলো।এছাড়াও,অরণ্যে তসর বা লাক্ষা চাষেরও অধিকার ছিলো।সরকারী দস্তাবেজ এবং জমিদারী খতিয়ানে এ জাতীয় অজস্রঅধিকারের উল্লেখ আছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নেহাত গা-জোয়ারী করেই,এই সব অধিকার শেষ করে দেওয়া হয়।

বনাধিকার আইনঃবাস্তু,কৃষি ও গ্রামভূমির উপর অধিকার

যদিও বনবিভাগ এবং রাজ্য সরকারি মন্ত্রীরা বনবাসীদের ‘পাট্টা’ ইত্যাদি দিচ্ছেন,আইনে পাট্টা দেবার কথা কোথাও নেই।বলা হয়েছে(ধারা ৩-এর ক), ১৩ই ডিসেম্বর, ২০০৫ অবধি বনাঞ্চলে বসবাস করতে আসা ও কৃষিকাজে লিপ্ত মানুষদের পরিবারপিছু ৪ হেক্টরের পর্যন্ত জমি থাকতে পারে।এ কথা যে সব মানুষেরা বনভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস বা চাষাবাদ করছেন,তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।সরকার

তাদের বসবাসের জমি এবং কৃষিজমির দখলাধিকার(ইংরাজিতে possession) স্বীকার করে শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট দেবেন,যেখানে জমির পরিমাণ উল্লেখিত থাকবে।এই দখলপত্র কোনমতেই জমির ‘পাট্টা’ না।জমির মূল আইনী মালিক কার্যত বনবিভাগই থেকে যাচ্ছেন।

টুকরো-টুকরো বাস্তু বা কৃষিজমির ক্ষেত্রে দখলপত্র দেওয়া হবে।যেখানে গোটা গ্রাম বা বাজার বনভূমিতে বসে আছে,তার কি হবে? আইনানুযায়ী, বনগ্রাম,টঙিয়া বস্তি,এফডি হোল্ডিং সহ বনাঞ্চলে অবস্থিত সব ধরণের গ্রামের(যাবতীয় অ-নথিভুক্ত এবং অ-সমীক্ষিত গ্রাম সহ,অর্থাৎ যে গ্রাম সম্পর্কে কোনো সরকারী তথ্য নেই, সে গ্রামও আইনের আওতায় আসবে) রাজস্ব গ্রামে রূপান্তরণ এখন একটি অধিকার। আইন-মাফিক বিজ্ঞপ্তি জারী করে,রাজ্য সরকার স্বচ্ছন্দে পারেন বনভূমিতে অবস্থিত সব কটি গ্রামকে রাজস্ব গ্রামে পরিণত করতে। যতক্ষন না একটি বনবস্তিকে(বা বনভূমিতে স্থিত যে কোনো গ্রামকে) আইনের (৩জ/3h) অনুযায়ী রাজস্বগ্রামে পরিবর্তন করা হচ্ছে, এবং ওই বস্তির বনভূমিকে ‘খাস’ জমিতে পরিণত না করা হচ্ছে, ততক্ষন সেই ভূমিতে মালিকানা অধিকার সহ কাউকে পাট্টা দেওয়া দেওয়া যায় না। বনবস্তিকে ‘খাস’ করে রাজস্বগ্রামে পরিণত না করে বিক্ষিপ্ত দখলপত্র বিলি করার অর্থ এই যে বনবস্তিগুলি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে,বস্তির খেলার মাঠ,রাস্তা,ধর্মীয় স্থান এমনকি বস্তিবাসীদের বসবাসের জায়গার উপরেও বনদপ্তরের কর্তৃত্ব থেকেই যায়।

বনাধিকার আইনঃবন সংরক্ষণের এবং পরিচালনার অধিকার

প্রস্তাবনায় কি বলা হয়েছে আগেই দেখেছি। আইনে দুটি জায়গায় এবিষয়ে নির্দিষ্ট বিধান আছে। ৩-এর(ঝ) এবং ৫-এর ১,২,৩ ও ৪ ধারা অনুযায়ী, গ্রামসভাকে এলাকার বনাঞ্চলের সম্পূর্ণ পরিচালনা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ৩-এর (ঝ) ধারা অনুযায়ী, গ্রামসভা এখন যে কোনো সাধারণ বন বা কমিউনিটি ফরেস্ট রিসোর্সকে রক্ষা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে পারবে। ৫-এর ১/২/৩/৪-এ বলা আছে গ্রামসভা এবং বনাধিকারভোগীরা যে কোনো বনকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ(বন,বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ) করার প্রয়োজনে যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে।বনধ্বংস করতে পারে,বা গ্রামসভার সদস্যদের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে নষ্ট করতে পারে এমন যে কোন কাজ ঠেকানোর ক্ষমতাও গ্রামসভাকে দেওয়া হয়েছে।

এখানে মনে করা ভালো,কোদাল বস্তি গ্রামসভা আইনের উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী সাইনবোর্ড টাঙিয়েছিলেন।প্রয়োজন মনে করলে,এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, গ্রামসভা এই কাজ(বা অন্য যে কোনো কাজ,যথা জঙ্গলে ঢোকার মুখে পাহারাদারী চৌকি বসানো,জঙ্গলে কাঠকাটা বন্ধ করা) আবার করতেই পারেন। আইনে কোথাও বলা নেই, এর জন্য গ্রামসভাকে সরকারের কি পুলিশের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে। অতএব ঠিক কোন আইনে বনবিভাগ এবং পুলিশ এই কাজকে বে-আইনী ঠাউরেছেন, তা তাঁরাই জানেন।যাঁরা সাইনবোর্ড খুলে এবং ‘বাজেয়াপ্ত’ করে আইন রূপায়ণের কাজে বাধা দিয়েছেন, বনাধিকার আইনের ৭ নং ধারা অনুযায়ী,কেন তাঁদের জরিমানা করা হবে না,তারও কোনো উত্তর নেই।

বনাধিকার আইন রূপায়ণ :গ্রামসভা কি এবং তা কি করবে

বনাধিকার আইন অনুযায়ী,এই আইন রূপায়ণের মূল দায়িত্ব গ্রামের মানুষের।

গ্রাম কি?

বনাধিকার আইনের ২-এর (ত)-ধারার ৩ নং উপধারায় বলা আছে বনভূমিতে স্থিত যে কোনো গ্রামই 'গ্রাম',অর্থাৎ গ্রামের মানুষ যে এলাকাটিকে গ্রাম বলে মানেন তাই-ই গ্রাম,সরকার তাকে গ্রাম বলে মানুন না মানুন। রাজ্য সরকারের আইনে গ্রামের অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকলে তা-ও গ্রাহ্য হবে।কিন্তু সেই ব্যাখ্যা একমাত্র ব্যাখ্যা হিসাবে ধরা যাবে না,গ্রামের মানুষের ধারণা অনুযায়ী 'গ্রাম' নির্ধারিত হবে।

গ্রামসভা কি?

একটি গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বাসিন্দারা গ্রামসভা(বাসিন্দারা একসঙ্গে বসলেই গ্রামসভা) গঠন করবেন। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে সভায় অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি থাকতে হবে।

গ্রামসভার দায়িত্ব

প্রত্যেক গ্রামসভা নিজের নিজের গ্রামে বনাধিকার আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তি অধিকার(যা ধারা ৩ অনুযায়ী স্বীকার্য) গণ-শুনানির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করবেন,এবং মানচিত্র সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সহ প্রস্তাবাকারে তা সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের কাছে জমা করবেন। ব্যক্তি-অধিকারে থাকা বাস্তু ও কৃষিজমি,এবং গোষ্ঠী-অধিকারে থাকা গ্রামের অন্যান্য ভূমি,যথা খেলার মাঠ,রাস্তা,বিদ্যালয়,ধর্মীয় স্থান,এই উভয় ক্ষেত্রেই মানচিত্র বানানো দরকার। সাধারণ বন বা কমিউনিটি ফরেস্ট রিসোর্স-এর ক্ষেত্রেও মানচিত্র লাগবে। মানচিত্র বানানোয় সরকার গ্রামসভাকে সাহায্য করবেন।

বনাধিকার কমিটি কি?

উপরোক্ত কাজ করার জন্য প্রত্যেক গ্রামসভা এক বনাধিকার কমিটি (Forest Rights Committee বা FRC) গঠন করবেন।আইনানুযায়ী,গ্রামসভার সদস্যদের মধ্য থেকে ১৫জনের বনাধিকার কমিটি নির্বাচিত হবে।এই কমিটি অধিকার-প্রস্তাব তৈরী করে গ্রামসভার কাছে জমা করবেন।প্রস্তাবের সঙ্গে,যথাযথভাবে ভর্তি করা,ব্যক্তি-অধিকারের জন্য নির্দিষ্ট দাবীপত্র 'ক' ও গোষ্ঠী-অধিকারের জন্য দাবীপত্র 'খ' থাকা দরকার।

দাবীপত্র কি? তা কিভাবে ভর্তি করতে হবে?

ধারা ৩-এ উল্লেখিত যাবতীয় অধিকারের স্বীকৃতির জন্য অধিকারভোগী আদিবাসী-অরণ্যবাসী মানুষদের নিজের নিজের গ্রামসভার এবং বনাধিকার কমিটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দাবীপত্র জমা দিতে হবে।বনাধিকার কমিটি এই দাবীপত্র ভর্তি করতে সাহায্য করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি 'ক' পত্র জমা দিয়ে নিজের কৃষিজমির ও বাস্তুজমির পরিমাণ এবং বনজ সম্পদের উপর কোনো দাবী থাকলে তা(ধরা যাক,বছরে কোনো অধিকারভোগী পরিবার জঙ্গল থেকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সালপাতা,কঁন্দুপাতা বা অন্যান্য ফল,বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন--সংগৃহীত জিনিসের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে) জানাবেন।

‘খ’ পত্রের মাধ্যমে একটি গ্রামের যাবতীয় গোষ্ঠী-অধিকারের দাবী করতে হবে। একটি গ্রামের জন্য একটিই গোষ্ঠী-দাবীপত্র জমা পড়বে। দরকার মতো অতিরিক্ত পাতা ব্যবহার করতে হবে। গোষ্ঠী-দাবীপত্রকে প্রথমে বনাধিকার কমিটি ও পরে গ্রামসভা অনুমোদন করবেন।

দাবীপত্রের সঙ্গে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে হবে।

সাক্ষ্যপ্রমাণ কি?

ব্যক্তি/গোষ্ঠী অধিকারের জন্য নানাবিধ সম্ভাব্য সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা আইনের নিয়মাবলীর ১৩ ধারায় বলা আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভোটার পরিচয়পত্র, রেশান কার্ড, খাজনা দলিল বা অন্য যে কোনো সরকারী বা আধা-সরকারী দলিল বা দস্তাবেজ, যা থেকে বোঝা যায় দাবীদার কোন অঞ্চলের বাসিন্দা।

বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী দলিল, মামলার কাগজপত্র, গবেষণাকর্ম ইত্যাদিও প্রমাণ হিসাবে গণ্য।

কোনো কাগজপত্র না থাকলে, জমিতে বসবাস বা জমি-ব্যবহারের অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাতে হবে, যথা জমিতে ঘরবাড়ি, সেচ ব্যবস্থা, কুয়ো, আল, সমাধিক্ষেত্র/শ্মশান, দেবস্থান ইত্যাদি।

গ্রামের কোনো বয়স্ক মানুষের মুখের কথা লিখে নিলে তাও প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

অরণ্যের উপর গোষ্ঠী-অধিকারের প্রমাণ হিসাবে অরণ্য এলাকা ব্যবহারের যে কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন গ্রাহ্য হবে, যথা নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হয় এমন বনজ সম্পদ যেখানে আছে সে জাতীয় এলাকা (ধরা যাক, কোনো এলাকায় প্রচুর বন্য আলু বা অন্য যে কোনো ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়)। এছাড়া, গোচারণক্ষেত্র বা মাছ ধরার জায়গা, দেবস্থান, সমাধিক্ষেত্র, সেচব্যবস্থা, বসতি কি চাষের চিহ্ন--এ সবই প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

মোট যে কোনো দু ধরনের প্রমাণ দিতে হবে।

দাবীদার কারা হবেন? অধিকারভোগী কে?

অরন্যে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ বনাধিকারের দাবীদার হতে পারেন। জীবিকার প্রয়োজনে দিনের একটা নির্দিষ্ট অংশ যাঁদের বনের মধ্যে কাটাতে হয়, তাঁরাই “অরণ্যে বসবাসকারী” হিসাবে গণ্য হবেন। তফশিলী জনজাতিভুক্ত মানুষ, যাঁরা ২০০৫-এর ১৩ই আগস্টের আগে অরণ্যে বসবাসের প্রয়োজনে এসেছেন, তাঁরা অধিকারভোগী হিসাবে গণ্য হবেন। তফশিলী জনজাতিভুক্ত নন এমন মানুষদের অরণ্য এলাকায় তিন পুরুষ বা ৭৫ বছর ধরে বসবাসের প্রমাণ দিতে হবে। লক্ষ্যণীয়, বলা হয়েছে “অরণ্য এলাকা”, যে জমি বা অরণ্যের দাবী করা হচ্ছে, নির্দিষ্টভাবে সেখানে বসবাসের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ কোনো পরিবার যদি অরণ্যের যে কোনো অংশে ধারাবাহিকভাবে বসবাস করে আছেন, তাঁরা দাবী করতে পারবেন। গ্রামের বয়স্ক মানুষদের কথা এক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

গ্রামসভা-মহকুমা স্তরীয়-জেলা স্তরীয় কমিটি

বনাধিকার কমিটির প্রস্তাব গ্রামসভা বিবেচনা করে অনুমোদন করলেই তা মহকুমা-স্তরীয় কমিটিতে পাঠানো যাবে। মহকুমা-স্তরীয় ও জেলা-স্তরীয় কমিটিতে(সেখানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত রাজের প্রতিনিধিরা থাকবেন) গ্রামসভার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে,এবং কোনো দাবীর বিরুদ্ধে কারুর কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য থাকলে,মহকুমা কমিটি তা পুনর্বিবেচনার জন্য গ্রামসভার কাছে ফেরত পাঠাবেন। গ্রামসভা জমা দিয়েছেন এমন কোনো দাবী,গ্রামসভাকে না জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা মহকুমা বা জেলা স্তরের কমিটির নেই। আইনের নিয়মাবলির ১১ এবং ১২ নং ধারায় বিস্তারিত ভাবে গ্রামসভার দায়িত্ব এবং ক্ষমতার কথা বলা আছে।

সরকার যা করছেন

এ তো গেলো আইনের কথা।বাস্তবে কি ঘটছে?

গ্রামসভা না গ্রামসংসদ? বে-আইনী সরকারী তৎপরতা--উত্তরে প্রতিরোধ

মোটামুটি ২০০৮-এর মার্চ থেকে প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পশ্চিমবঙ্গে বনাধিকার আইন রূপায়ণের সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়।কোনোরকম পূর্ব ঘোষণা বা প্রস্তুতি ছাড়াই,সরকারি আধিকারিকরা দল বেঁধে বিভিন্ন গ্রামে ঢুকতে থাকেন,এবং গ্রামবাসীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই,চটজলদি,গ্রাম-সংসদ অনুযায়ী বনাধিকার কমিটি তৈরী হতে থাকে।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০০৮-এর মার্চে পাঠানো দুটি আদেশনামা অনুসারে,এই কাজ করা হয়।যেখানে যেখানে গ্রামবাসীরা আইনটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন,যেমন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার প্রায় সর্বত্র,সেখানে সেখানেই তাঁদের তরফ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।গ্রামবাসীদের বক্তব্য ছিলো,যেহেতু আইনের ২ নং ধারায় বনগ্রাম(টেঙিয়া,এফ ডি হোল্ডিং সহ বনভূমিতে স্থিত সব ধরনের গ্রাম) ‘গ্রাম’ হিসাবে গণ্য,প্রত্যেক পৃথক গ্রামের জন্য আলাদা গ্রামসভা ও আলাদা বনাধিকার কমিটি করা দরকার।তাঁরা যথাযথভাবেই দেখান,যেহেতু আইন রূপায়ণের ক্ষেত্রে গ্রামসভাই মূল প্রতিষ্ঠান,গ্রামসভাগুলি খুব বড় হলে,বা বিভিন্ন আলাদা গ্রাম নিয়ে তৈরী হলে,বনাধিকার কমিটি কাজ করতে পারবে না,গ্রামসভার বৈঠক করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে।আইন রূপায়ণে সহসা অতি-উদ্যোগী হয়ে ওঠা প্রশাসন এ সব যুক্তির কথায় কান দিতে রাজি ছিলো না।ফলত,উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র(বক্সা বাঘ এলাকা এবং জলপাইগুড়ি বনাঞ্চলের কিছু এলাকা ছেড়ে) গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে গ্রাম-ভিত্তিক বনাধিকার কমিটি গঠন করেন।যেখানে যেখানে সরকারি আধিকারিকরা নেহাৎই জোর করে কমিটি বানিয়েছিলেন,গ্রামসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলি ভেঙে দেন মানুষ।পুরো ২০০৮ এবং ২০০৯-এর মাঝামাঝি,সংসদীয় নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া তক,নানান রকম সরকারি জোরজবরদস্তি তবু চলতেই থাকে।

দক্ষিণে সরকারী গা-জোয়ারি

দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহল-সহ অন্যান্য জেলায় বনাধিকার আইন বিষয়ে সচেতন গণ-উদ্যোগ বিশেষ ছিলো না। এর ফলে অবাধ সরকারী যথেষ্টাচার চলতে থাকে,কোথাওই আইনটির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে মানুষকে জানানো হয় না।গ্রাম-সংসদ এবং গ্রাম-উন্নয়ন সমিতির দোহাই দিয়ে বনাধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী আলাদা করে গ্রামসভা বা বনাধিকার কমিটি গঠনের বিষয়টিকে প্রায় সর্বত্রই অগ্রাহ্য করা হয়,গ্রাম সংসদই হয়ে ওঠে গ্রামসভা,গ্রাম-উন্নয়ন কমিটি বনাধিকার কমিটি।

সুন্দরবনের বিপুল সংখ্যক বন-নির্ভর মানুষকে আইনের আওতাতেই আনা হয় না। বন্য প্রাণী বাঁচানোর নামে সেখানে বনবিভাগের একচ্ছত্র শাসন আগের মতোই বলবৎ থাকে।

বনাধিকার কমিটিতে সরকারী প্রতিনিধি?

আইনানুযায়ী, একটি গ্রামের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের নিয়ে গ্রামসভা গঠন করে গ্রামসভার মাধ্যমে ১৫ জনের বনাধিকার কমিটি গঠন করার কথা। কি উত্তরবঙ্গে কি দক্ষিণবঙ্গে বাস্তবে ৬-৭ টা বা তার বেশি গ্রাম নিয়েও এক-একটি সরকারি, গ্রাম-সংসদ স্তরের, বনাধিকার কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইনে আছে বনাধিকার কমিটির সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৫ জন। কিন্তু জলপাইগুড়ি-সহ বিভিন্ন বনাঞ্চলে ১৫ জনের বদলে ১৯ জনকে নিয়ে বনাধিকার কমিটি গঠিত হয়, যার মধ্যে আবার ৪ (চার) জন সরকারী কর্মচারী! বনাধিকার কমিটিতে গ্রামের বাইরের কোন লোক থাকতে পারেন না কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইরের থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে ঢোকানোর চেষ্টা চলে।

বনবিভাগের কর্তালি

আইনে বলা হয়েছে গ্রামসভা বনাধিকার কমিটির সাহায্যে গ্রামের সদস্যদের থেকে দাবীপত্র সংগ্রহ করে মহকুমা স্তরের কমিটির কাছে সরাসরি জমা দেবে, কিন্তু সরকারী পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বলা হয় দাবীপত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার বা বি ডি ও-র কাছে জমা দিতে হবে এবং তা রেঞ্জ অফিসারের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। বেশীর ভাগ জায়গায়, গোটা সরকারী প্রক্রিয়াটিই বনবিভাগের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলত, নিতান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, কোনো গোষ্ঠীগত বনাধিকারের কথা গ্রামের লোকদের জানানো হয়না। স্রেফ ‘পাট্টা’ দেবার কথা বলা হতে থাকে। এমনকি, দক্ষিণবঙ্গের বহু এলাকায় গোষ্ঠী-অধিকারের দাবীপত্র ‘খ’ বিলি করাই হয় না।

দাবীপত্র জমা দেবার শেষ দিন?

আইনের কোন ধারাতেই বনাধিকারের দাবীপত্র (Claim Form) জমা দেবার কোনো নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ দেওয়া নেই। গ্রামসভাকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সরকারী আধিকারিকরা এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা গ্রামে গিয়ে ‘নির্দিষ্ট দিন’ বলে যেতে থাকেন এবং সেই দিনের মধ্যে দাবীপত্র জমা না দিলে তা আর গ্রহন করা হবে না বলে গ্রামবাসীদেরকে ভয় দেখান। এইভাবে, বনাধিকার আইনের বিষয়টিকে একটি মাথাভারী প্রশাসনিক-রাজনৈতিক উদ্যোগে পরিণত করার অপচেষ্টা চলে, এবং এক্ষেত্রে গ্রামসভার প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়। রূপায়ণের নামে আইনটিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অগ্রাহ্য করতে থাকেন সরকার।

পাট্টা দিচ্ছে কে? গ্রামসভা কোথায়?

বনাধিকার আইনের নিয়মাবলীর ধারা ১১ ও ১২ অনুযায়ী গ্রামসভা যতক্ষণ না আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ত জমা-পড়া দাবীগুলিকে খুঁটিয়ে দেখবে, এবং এর পরে গ্রামের বেশীরভাগ মানুষের লিখিত সম্মতি-সহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব মহকুমা স্তরের কমিটিকে জমা না দেবে, এই দাবীগুলি সরকারি বিচার-বিবেচনার স্তরেই আসবে না। যে যে ক্ষেত্রে তথাকথিত ‘পাট্টা’ দেওয়া হচ্ছে, এবং যে যে জায়গায় নানারকম ভয় দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে দাবীপত্র জমা করানো হয়েছে (উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, বক্সা ও কাশিয়াং বনাঞ্চলে), কোথাও-ই গ্রামসভা আনুষ্ঠানিক কোন প্রস্তাব জমা দেয় নি। এক্ষেত্রে ‘পাট্টা’ দেওয়া হয় কি করে?

বনাধিকার আইনের বিরুদ্ধে সরকারঃ পিছনের দরজা দিয়ে যৌথ বন-পরিচালনা বা জেএফএম
বনাধিকার আইনের নিয়মাবলির ৪-এর ১ নং ধারার ‘ঙ’ উপধারায় বলা হয়েছে যে আইনের ৫ নং ধারা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক গ্রামসভা বিভিন্ন বন-পরিচালন কমিটি তৈরি করবে। এই কমিটিগুলি বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র রক্ষায় গ্রামসভার হয়ে সবধরনের বনপরিচালনার কাজ করবে। ধারা ৫-এ দেওয়া এই ক্ষমতা এবং ধারা ৩-এ দেওয়া সমস্ত অধিকার(জ্বালানীকাঠ সহ যাবতীয় উদ্ভিদজাত এনটিএফপি-র মালিকানা, পশুচারণ ও মাছ ধরবার অধিকার, বনগ্রামকে রাজস্বগ্রামে পরিণত করবার অধিকার এবং এ ছাড়াও অন্যান্য পারস্পরিক অধিকার)কে প্রায় নস্যাৎ করে ২০০৮-এর ডিসেম্বর মাসে রাজ্য সরকার এক নয়া যৌথ-বন পরিচালন নীতি(JFM) ঘোষণা করেছেন। এই নীতি অনুযায়ী, বন থেকে সম্পদ সংগ্রহ বা বনের যে কোনো রকম ব্যবহার নির্ভর করবে বন দপ্তরের ইচ্ছার উপর, তাঁদের তত্ত্বাবধানে যৌথ বন কমিটি বা JFMC(আগে বলা হতো বন-সুরক্ষা কমিটি বা FPC) তৈরী হবে, এবং ‘ভালো কাজ’ করলে বনদপ্তর কমিটিদের এলাকার কাঠ-বিক্রীর লভ্যাংশ থেকে শতকরা ১৫-২৫ ভাগ(উত্তরে ১৫) পর্যন্ত দেবেন। অন্যান্য বন সম্পদেও বন দপ্তরের ইচ্ছাসাপেক্ষে, কমিটির সদস্যদের কিছু কিছু অধিকার থাকবে।

কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদির টাকায় এই রাজ্যে গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই তথাকথিত যৌথ বন-পরিচালন চলেছে। এই ব্যবস্থার আঁতুড়ঘর দক্ষিণবঙ্গের শালজঙ্গলেই এখন প্রক্রিয়াটি মুখ খুবড়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গে বিষয়টি সেভাবে চালুই হয় নি। নিতান্ত এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক কিছু বনরক্ষা কমিটি কি ইকো-ডেভলপমেন্ট কমিটি(বন্য প্রাণীর জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে লোকের জঙ্গলে ঢোকা বারণ ছিলো, অতএব তাঁদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বনবিভাগ ‘প্রকল্প’ দিতেন) তৈরী হয়েছিলো, মূলত গ্রামের কিছু ক্ষমতামালী মাতব্বরদের নিয়ে। সাধারণ গ্রামবাসীর এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই থাকতো না। এই কমিটির সভা ডাকতেন সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার, যিনি কিনা কমিটির সম্পাদকও বটে। আদ্যন্ত অগণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়াটিকে বনদপ্তর আপাতত JFMC(Joint Forest Management Committee বা যৌথ বন পরিচালন কমিটি)-র নামে গ্রামসভার উপর চাপানোর চেষ্টা করছে। উত্তরবঙ্গের বনবস্তির মানুষদের ভয় দেখানো হচ্ছে, JFMC তৈরী না হলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত আদিবাসী উন্নয়নের টাকা ফেরৎ যাবে। এমনকি চিলাপাতা এলাকায় একাধিক গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রামোন্নয়নের টাকা নিতান্ত গায়ের জোরে আটকে রেখেছে বনদপ্তর, বলা হচ্ছে জঙ্গলে গাছ কাটতে(বা clear felling) না দিলে, টাকা ছাড়া হবে না।

বনাধিকার আইন বা দেশের কোনো আইনেই যৌথ বন পরিচালনার কথা বলা নেই। এছাড়া যেহেতু বনাধিকার আইনে অরণ্য পরিচালনার সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ক্ষমতা গ্রামসভাকে দেওয়া হয়েছে, এর বিরোধিতা করার কোনো আইনী অধিকার বনদপ্তরের থাকতে পারে না। ১৯২৭-এর ঔপনিবেশিক ভারতীয় বন-আইন, ১৯৭২/২০০২/২০০৬-এর বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন এবং অংশত বন সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বন পরিচালনার যে সর্বময় কর্তৃত্ব বনদপ্তরের ছিলো, বনাধিকার আইন-পরবর্তী সময়ে তা চূড়ান্তভাবেই খন্ডিত। যত বেশী সংখ্যক মানুষ তাঁদের অধিকারের কথা জানবেন-বুঝবেন, যত ক্ষমতাবান হয়ে উঠবে গ্রামসভাগুলি, যত বেশী সাইনবোর্ড অরণ্য এলাকায় লাগানো হবে, ততই কমতে থাকবে বনের উপর বনদপ্তরের অধিকার।

কার জঙ্গল? কার ক্ষমতা?

আসল বিভ্রান্তিটা এইখানেই। মানুষ ক্ষমতাবান হয়ে উঠুক তা প্রায় কেউই চান না, কি বড় রাজনৈতিক দল, কি সরকারি আমলা। সুতরাং বনাধিকার আইনের মতো একটি বৈপ্লবিক এবং ঐতিহাসিক আইনকে ‘পাট্টা’ দেবার প্রহসনে পর্যবসিত করা হয়, বনবাসী মানুষের ‘অজ্ঞানতা’কে ধ্রুব ভেবে, ও এ বিষয়ে শহুরে মধ্যশ্রেণীর প্রায়-সহজাত উপেক্ষাকে সম্বল করে, নেতা-মন্ত্রী-আমলারা যথেষ্ট মিথ্যা বলে যেতে থাকেন। অন্যদিকে বন বাঁচানোর নামে কি মাওবাদী-দমনের নিরাপত্তাজনিত কারণে জঙ্গলে সরকারি গুলি চলতেই থাকে, প্রতি বছর নিয়ম করে সেই গুলিতে মরে যেতে, পঙ্গু হয়ে যেতে থাকেন অরণ্যের আসল মালিক, বনবাসী আদিবাসীরা। অন্যত্র অরণ্য ভরে উঠতে থাকে বড় মানুষের পর্যটনে, পর্যটকদের গাড়ির ধোঁয়ায় আর তাঁদের ফেলে যাওয়া অফুরন্ত প্লাষ্টিকে।

কে বিভ্রান্তি ছড়ায়? জঙ্গল আসলে কার?

দক্ষিণবঙ্গের আদিবাসীরা আর সুন্দরবনের মৎস্যজীবী-মধু-সংগ্রাহকেরা পুরুষানুক্রমে যে অরণ্য ব্যবহার করে এসেছেন, যে অরণ্যে তাঁদের ঐতিহাসিক অধিকার, ইংরেজ শাসককূল ও স্বাধীন ভারতের শাসকেরা সেই অরণ্য কেড়ে নেয়। ইংরেজরা যখন দক্ষিণের জঙ্গলমহল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের দিয়ে দেয়, জঙ্গল হাসিল করে প্রজা বসানো হতে থাকে। কিছু কিছু বনখন্ড, যা জঙ্গল হিসাবেই থেকে যায়, তাতে ওই এলাকার প্রজাদের, এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের বিভিন্ন লিখিত-অলিখিত অধিকার ছিলো। এ সত্ত্বেও, ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরের মধ্যে, জঙ্গলমহলে অরণ্যের অধিকার নিয়ে একের পর এক আদিবাসী বিদ্রোহ হয়েছে, যা ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতার যুদ্ধের সঙ্গে মিশে যায়। এই বিদ্রোহগুলির গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে, অরণ্যে আদিবাসী-অরণ্যবাসী মানুষের সমস্ত অধিকারকে অগ্রাহ্য করে, স্বাধীন ভারতের বনবিভাগ জমিদারী জঙ্গলগুলিকে দখল করে। যে কাজ ইংরেজ বনকর্তারা একশো বছর ধরে (১৮৬৫-তে বনবিভাগ তৈরীর পর থেকেই এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা হয়) করার সাহস পান নি, যাবতীয় আইন-কানুনকে কলা দেখিয়ে, সেই কাজ অনায়াস নির্লজ্জতা নিয়ে করে ফেলেন ‘ভারতীয়’ বন-আমলারা। যে বনে সরকারের কোনো আইনী অধিকার নেই, সেই বন বিনা বাধায় ‘সরকারী’ হয়ে যায়।

বনাধিকার আইন ২০০৬ জঙ্গলমহলের মানুষের সামনে এক সুযোগ এনে দিয়েছে, অরণ্যের অধিকারের দাবীতে এক নতুন লড়াই শুরু করার।

বনাধিকার আইন অনুযায়ী, সুন্দরবনের মানুষও তাঁদের ন্যায্য অধিকারের দাবী ওঠাতে পারেন। আইন বলছে, যাঁরা জীবিকা বা অন্য প্রয়োজনে বনে যেতে বাধ্য হন, তাঁরাই বনবাসী। সুন্দরবনের ভিতরে মানুষ নেই বলে বন-দপ্তর যে দাবী করছে, তা সর্বৈব মিথ্যা।

যে মানুষেরা ঔপনিবেশিক সময় থেকে শুরু করে এই সেদিন পর্যন্ত শ’ শ’ কোটি টাকার রাজস্ব সরকারকে দিয়েছেন, রক্তজল করে, বেগার খেটে যাঁরা গাছ লাগিয়েছেন, বাঁচিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের আদত বনবাসী, পাহাড়-সমতলের ২৩০টিরও (সরকারি হিসাবে ১৭৮) বেশী বনগ্রামের কয়েক লক্ষ বাসিন্দা এখন দিন কাটাচ্ছেন উপায়হীন দারিদ্রে। বনশ্রমিক হিসাবে একদা তাঁদের যা সুযোগসুবিধা ছিল, তার সবই এখন অমিল। কাঠ ও অন্যান্য বনসম্পদের বাণিজ্যিক উৎপাদন কমে আসা, বনক্ষেত্রে শ্রমদিবস তৈরীর

সুযোগ কমে যাওয়া,এবং সর্বোপরি প্রাকৃতিক বন নষ্ট হয়ে যাবার ফলে,তঁারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।যেহেতু বাস্তব কি চাষজমির ওপর তাঁদের কোন আইনী অধিকার এতদিন পর্যন্ত ছিলো না,উন্নয়নের সাধারণ সুযোগ থেকেও তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন।২০০৬ নাগাদ,নেহাং প্রায় আলটপকাই,বনগ্রাম উন্নয়নের এক কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প এসে না পড়া অবধি বনদপ্তর এঁদের উৎপাতই ভাবতেন।এই প্রকল্পের পর অবশ্য উন্নয়নের কাজ জায়গায় জায়গায় হচ্ছে,বনগ্রামে আসছে এনআরজিইএ প্রকল্পের ১০০ দিনের কাজও।কিন্তু এই উন্নয়ন কি কাজের সবটাই প্রায় হচ্ছে বনদপ্তর মারফৎ,এবং বনবিভাগ বনগ্রামবাসীদের উপর তাঁদের চিরাচরিত জমিদারী কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এই ‘উন্নয়ন’কে এক মহা অস্ত্র ঠাউরেছেন। এফডিএ তহবিল নামে খরচা হওয়া এই টাকার হিসাব গ্রামের মানুষকে জানানো হচ্ছে না,এবং তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করা হলেও,বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই টাকা খরচার কোনো হিসাব জানাতে প্রচুর টালবাহানা করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের বনগ্রামের রাভা-মেচ-গারো-ডুকপা-লিম্বু-শেরপা-রাই ইত্যাদি আরণ্যক জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ,যাঁরা যথাক্রমে বিনা মজুরীতে,কম মজুরীতে এবং বনবিভাগের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে দিন কাটিয়েছেন, অরণ্যের অধিকারের লড়াইটা উত্তরবঙ্গে শেষত তাঁরাই লড়ছেন। বনাধিকার আইনের রূপায়ণেরই দাবীও তাঁরাই ওঠাচ্ছেন,সরকারি আধিকারিকদের আইনের বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছেনও তাঁরা।এমন কি হতে পারে না যে প্রশাসন কি বনবিভাগ এঁদের শত্রু ভাবা বন্ধ করলেন,মেনে নিলেন অরণ্যের উপর এঁদের আইনসিদ্ধ অধিকার? বন পরিচালনার ক্ষেত্রে বনবিভাগের কর্মী-অফিসারেরা গ্রামসভাগুলিকে সাহায্য করলেন,অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলি বনজ সম্পদ বিক্রীর ক্ষেত্রে দিলেন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা? গাড়ি গাড়ি সৈন্য পাঠিয়ে নয়,বড় বড় কুৎসিত কংক্রিট দালান তুলে,বনে জঞ্জাল বিছিয়ে নয়।বনগ্রামগুলিতে গড়ে তোলা হলো গ্রামসভা-পরিচালিত পরিবেশসম্মত পর্যটন কেন্দ্র,গ্রামের উন্নয়নে কি কাজ কোথায় কিভাবে করা হবে তা গ্রামসভা বসিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে ঠিক হলো?

এসবই কি অবাস্তব,কোনদিন হবার নয়,এমন কষ্টকল্পনা? সরকার বিষয়টা নিয়ে ভাবুন,ইত্যবসরে বনবাসীরা তাঁদের ন্যায্য লড়াইও চালাতে থাকুন। সরকার গনতন্ত্র-টন্ত্র নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামাতেও পারেন।অরণ্যে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বনবাসীদের কাছে অস্তিত্বের,আত্মমর্যাদার,স্বাভিমানের।তাঁদের পক্ষে এখন আর সরকারী জমিদারি চূপচাপ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

পরিশিষ্টঃ বনাধিকার আইন ও গণ-সংগঠনগুলি কি করতে পারে

কাজ ১/গ্রামসভা গঠন

যে যে গ্রামে এখনো অবধি গ্রামসভা গঠিত হয় নি,সেই সেই গ্রামের নিজস্ব গ্রামসভা গঠন করতে হবে।বনাধিকার আইন অনুসারে তৈরী এই গ্রামসভা গ্রাম সংসদ থেকে ভিন্ন হবে,বিশেষত যখন বিভিন্ন গ্রামের সদস্যরা জঙ্গলের আলাদা আলাদা অংশ ব্যবহার করেন।একই জঙ্গল একাধিক গ্রামসভার সদস্যরা যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন,সেখানে প্রয়োজনমত সংশ্লিষ্ট গ্রামসভাগুলির যৌথ বৈঠক ডাকতে হবে।

কাজ ২/বনাধিকার কমিটি গঠন

যে যে গ্রামে এখনো বনাধিকার কমিটি নেই, সেই সেই গ্রামে প্রতি গ্রামসভা নিজস্ব বনাধিকার কমিটি তৈরী করবে।এর সঙ্গে গ্রাম-উন্নয়ন সমিতি বা সরকারী আধিকারিকদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।গ্রাম-সংসদ স্তরে এর আগে যে সরকারী কমিটি হয়েছে,প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার বৈঠক ডেকে এই কমিটি ভেঙে দিতে হবে।

কাজ ৩/বনাধিকার কমিটির মাধ্যমে দাবীপত্র ভর্তি ও পেশ

গ্রামসভা-স্তরে আইনে উল্লেখিত অধিকার নিয়ে প্রচার চালাতে হবে,এবং মানুষকে তাঁদের আইনী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এর পরে গ্রামে ভূমি-সমীক্ষার কাজ চালিয়ে,গ্রামের এবং নিকটবর্তী অরণ্যের উপযুক্ত মানচিত্র তৈরী করতে হবে।এই কাজে সরকারী সাহায্যের দাবী তুলতে হবে।ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দাবীপত্র দুটিই ভর্তি করতে হবে।অবশ্য যদি কোথাও ব্যক্তি-দাবীপত্র যথাযথভাবে জমা পড়ে থাকে,সেখানে বিশেষত অরণ্য-সম্পদের উপর গোষ্ঠী-দাবী জমা দিতে হবে।

সরকারী তরফে নতুন করে দাবীপত্র জমা না নেওয়া হলে,তার লিখিত কারণ জানতে চাওয়া উচিত।এক্ষেত্রে,বিষয়টিকে আন্দোলনের বিন্দু করে তুলতে হবে।

যে যে গ্রামসভা এলাকায় তথাকথিত পাট্টা বিলি হয়েছে,সেখানে দাবীকৃত জমির পরিমাণের সঙ্গে পাট্টা-পাওয়া জমির পরিমাণ মিলিয়ে দেখতে হবে।প্রতি গ্রামসভা এলাকায় এভাবে যারা খন্ডিত পাট্টা(যা চাওয়া হয়েছিলো তার চাইতে কম) পেয়েছেন এবং যাঁরা পাননি,তাঁদের তালিকা তৈরী করতে হবে।যেখানে যেখানে বেনিয়ম ঘটেছে(কম জমির পাট্টা পাওয়া,শুধু বাস্তুজমির পাট্টা পাওয়া,গ্রামসভার বাইরের কারুর নামে পাট্টা আসা ইত্যাদি),তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বানিয়ে গ্রামসভা লিখিতভাবে মহকুমা শাসকের কাছে জমা করবেন।

কাজ ৪/ধারা ৫ অনুযায়ী বন-পরিচালনা সমিতি গঠন

প্রতি গ্রামসভা তার নিজস্ব বন-পরিচালন কমিটি গঠন করবে।এই কমিটি বনাধিকার কমিটি থেকে আলাদা হবে(যদিও একই ব্যক্তি দুটি কমিটিরই সদস্য থাকতে পারেন) এবং বনরক্ষা ও বন-ব্যবহার সম্পর্কে নিয়মকানুন তৈরী করবে।এই কমিটি কাজ করতে শুরু করলে বে-আইনী সরকারী বন-সুরক্ষা কমিটি বা ইকো-ডেভলপমেন্ট কমিটিকে গ্রামসভা লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভেঙে দেবে।ওই কমিটির সমস্ত দায়িত্ব বন-পরিচালন কমিটি গ্রহণ করবে।

গ্রামসভার আওতাধীন জঙ্গলে(অর্থাৎ বন-পরিচালন কমিটি যে জঙ্গলের দায়িত্ব নেবে),গ্রামসভাকে না জানিয়ে বনবিভাগ নিজেদের ইচ্ছামত কোনো কাজ করতে পারবেন না।

গ্রাম-উন্নয়নের জন্য যে অর্থ এখন বনবিভাগ ও বন-সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় তা পঞ্চগয়েত বা গ্রামসভার মাধ্যমে খরচার দাবী ওঠাতে হবে। এই খরচার ক্ষেত্রে গ্রামসভার মতামত গ্রহন অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে হবে।

কাজ ৫/পঞ্চগায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন

গ্রামসভার কাজগুলি স্থানীয় পঞ্চগায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে করা ভালো,এবং আইনত,পঞ্চগায়েতের সচিব গ্রামসভার সচিব হিসাবে কাজ করতে পারেন।কিন্তু গ্রামসভার সিদ্ধান্ত গ্রামসভা স্তরেই নিতে হবে,তা পঞ্চগায়েতে নির্ধারিত হবে না।